ফের আলোচনায় প্রযুক্তির ৫৭ ধারা

ইমদাদুল হক

দেশে এখন একই অপরাধের দুই ধরনের সাজা। কোনো অপরাধকে যদি 'ইলেকট্রনিক' মাধ্যমে ফেলা যায়, তাহলেই পাল্টে যাবে দৃশ্যপট। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে যেসব অপরাধের শাস্তি সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ দুই বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তা রূপান্তরিত হয়েছে ৭ থেকে ১৪ বছরের সাজায়। দুই বছরের সাজার বদলে ১৪ বছর জেল। দিনবদলের সাথে সাথে বদলে যেতে শুরু করেছে অপরাধের রকম-ফের। একই সাথে বদলে যাচ্ছে অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমও।

তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবারক্রাইম আইনের কঠোরতায় এমনই বিতর্ক এখন দেশজুড়ে। সম্প্রতি ইন্টারনেটে জনগণের মত প্রকাশে বাধাদান 'অসাংবিধানিক' বলে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয়ার পর ফের আলোচনায় এসেছে ২০১৩ সালে সংশোধিত বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইন। প্রশ্ন উঠেছে, এবার তাহলে আইনের ৫৭ ধারা বাতিল হবে কি? না এর অপব্যবহার চলতেই থাকবে?

ভারতের ৬৬ (এ) বনাম বাংলাদেশের ৫৭

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ২০০০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ও ৬৬ক ধারার সাথে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারার মিল রয়েছে। উন্নত বিশ্বে যখন ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হাত দেয়া যাবে না বলে জোরালো দাবি উঠেছে, গুগল ও ফেসবুক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এ বিষয়ে আরও নমনীয় হতে বলেছে, তখন বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ৫৭ ধারার মতো আরও কঠোর আইন করে মানুষের মুক্তচিন্তা বন্দী করে রাখছে।

বাতিল হয়ে যাওয়া ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ (এ) ধারায় কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য, ছবি বা ভিডিও পোস্ট করলে তাকে গ্রেফতার করা হতো। শুধু তাই নয়, ওই পোস্টে কেউ লাইক দিলেও গ্রেফতারের শিকার হতেন। আইনে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আপত্তিকর কিছু পোস্ট করলে অভিযুক্তকে সাথে সাথে গ্রেফতার করা হতো এবং দোষ প্রমাণ হলে অর্থদণ্ডসহ কমপক্ষে তিন বছরের কারাবাস করতে হতো।

অপরদিকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ (১) ধারায়, 'কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।'

বিধান অনুযায়ী, এই অপরাধে ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যূন সাত বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উভয় আইন ও শাস্তির বিধান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভারতীয় আইনটির চেয়ে বাংলাদেশের আইনটিতে শাস্তি আরও কঠিন করে তোলা হয়েছে। ২০০৬ সালে যখন প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি আইন করা হয়, তখন শাস্তি ছিল সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড। ২০১৩ সালে সংশোধন করে শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়। সেখানে সর্বনিম্ন কারাদণ্ড রাখা হয় সাত বছর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরাধ অজামিনঅযোগ্য করা হয়। আগে মামলা করার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। এখন তারও দরকার হয় না। অপরাধ আমলে নিয়ে পুলিশ শুধু মামলাই নয়, অভিযুক্তকে সাথে সাথে গ্রেফতারও করতে পারছে। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত মামলার অপব্যবহার দৃশ্যমান হারে বাড়ছে। মামলাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক মামলায় রূপ নিচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের মানহানি ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাবিষয়ক ৫৭ ধারার আওতায় দেশজুড়ে মামলার সংখ্যা সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তৃত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই ৫৭ ধারা কি সেই ৫৪ ধারা হতে চলেছে? সন্দেহের বশে পরোয়ানা ছাড়াই পাইকারি গ্রেফতারের হাতিয়ার হিসেবে দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার মতো শেষ পর্যন্ত এই আইনটিও যে কুখ্যাত হয়ে উঠবে না, এমন শঙ্কাও দেখা দিয়েছে। সাইবার অপরাধের ভয়াবহতাকে আমলে নিলেও প্রযুক্তির বিস্তারে ইন্টারনেটে 'মত প্রকাশ' করে অপরাধের মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং খসড়া 'সাইবার ক্রাইম' আইনে ধারা ১৪সহ বিভিন্ন ধারায় শব্দের প্রয়োগের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছে ডিজিটাল ডিভাইস আতঙ্ক। ১৪ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদেই 'জনগণের কোনো অংশের মধ্যে ধর্মঘট ঘটাইবার অভিপ্রায়' শব্দটি আইনের উদ্দেশ্যকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। একইভাবে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল ভারতের ৬৬ (এ) ধারা।

সঙ্গত কারণেই বিতর্কিত আইনটি বাতিলের আবেদন করেছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষার্থী শ্রেয়া সিঙ্ঘাল। সতীর্থ নাগরিক অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত কয়েকটি সংস্থার সহায়তায় দীর্ঘ আড়াই বছর লড়াই করে গত ২৫ মার্চ জয়ী হন শ্রেয়া। বিতর্কিত ৬৬ (এ) ধারার মামলার রায়ে শ্রেয়ার পক্ষে রায় দিয়ে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের ভাষ্য ছিল– 'একজনের কাছে যেটা আপত্তিকর, অন্যের কাছে সেটা আপত্তিকর নাও হতে পারে। কোনটি আপত্তিকর এবং কোনটি অতিমাত্রায় আপত্তিকর, তা কী করে নির্ধারণ করবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা?' শুনানিতে 'এই ধারার অপব্যবহার হবে না' মর্মে রাষ্ট্রপক্ষের ঘোষণা সত্ত্বেও ছাড় দেননি বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ভারতীয় বিচারপতিরা। তাদের সাফ বক্তব্য ছিল– 'সরকার আসবে, সরকার যাবে; কিন্তু ৬৬ (এ) ধারা থেকে যাবে।' অর্থাৎ অপব্যবহার বন্ধের গ্যারান্টি কোথায়। তাই সবশেষে ধারাটি বাতিলের ঘোষণা দেন সুপ্রিমকোর্ট। অবশ্য তাই বলে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে যেকোনো আপত্তিকর মন্তব্য বা ছবি পোস্ট করা যাবে এবং সে জন্য শাস্তি হবে না, তা নয়। শাস্তি হবে সাধারণ আইনেই। এই রায়টি বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই সমান।

তারপরও কি বহাল থাকবে?

প্রচলিত বেশ কিছু আইনের সাথেও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের শাস্তির মাত্রা বিরোধপূর্ণ। তারপরও ২০১৩ সালে তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধনের পর শুধু ৫৭ ধারাতেই গত এক বছরে প্রায় শতাধিক মামলা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ শুধু হাসি-ঠাট্টা বা মজা করার জন্য কিছু লিখে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে হয়রানির শিকার হয়েছেন। ধারাটি দেশের নাগরিকদের হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। একে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার কারণে ইন্টারনেটের যেকোনো কর্মকাণ্ড অপরাধ মনে করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বলা হচ্ছে, প্রচলিত আইনে খুন করে কেউ ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন; আর তথ্যপ্রযুক্তি আইনে কাউকে 'খুনি' বলেই ১০ বছরের জন্য কারাগারে থাকতে হতে পারে। 'খুনি বলা' আর 'খুন করা' এখানে যেন সমান অপরাধ!

ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ঘায়েলে আইনটির অপব্যবহার দিন দিন বাড়তে পারে বলে প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রচলিত অন্য আইনে একই অপরাধের বিচার করা গেলেও পুলিশ প্রশাসনের এখন সুযোগ পেলেই তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা ঠোকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর অজামিনযোগ্যতা, অন্তত সাত বছরের সাজা, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান– ভয় দেখানোর জন্য সবই উপাদেয় কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com